The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 91 - 104)
Published in November 2024

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাবনায় প্রাচ্যবিদদের চিন্তাদর্শন

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী *

প্রতিবাদ্যসার: ঔপনিবেশিক শাসনের একটি আনুষাঙ্গিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে প্রাচ্যবাদ। ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ প্রাচ্যবিদদের প্রায় সকলেই প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল; শুধু তাই নয়, সংস্কৃতি চর্চার সাথেসাথে পর্যায়ক্রমে তারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনার অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির ধারকবাহকগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম পণ্ডিত হিসেবে সর্বপ্রথম স্যার সাইয়েদ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) প্রাচ্যবিদদের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁর রচিত *খুতুবাতে আহমদিয়া* গ্রন্থে নবিজির সা. সীরাত নিয়ে তাদের অবাঞ্ছিত গবেষণাকর্মের জবাব দেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের আরেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) অবদানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের বিদ্যাবত্তা নিয়ে এই দু'জন বিখ্যাত পণ্ডিতের বোধ ও চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

ভূমিকা

বিশ শতকের নতুন নতুন বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ও চর্চা শুরু হয়েছে। দৃশ্যপটে এসেছে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আর্থসামাজিক পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় ঘটেছে পরিবর্তন। প্রগতিশীলতায় যুক্ত হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরালো হয়েছে প্রতিবাদ ও মুক্তিকামী আন্দোলন। একইভাবে বিভিন্ন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদের একেক দুর্গের পতনও ঘটছে। ভারত উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব ক্রমেই শিথিল হতে চলেছে। অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম ও ইসলামি আন্দোলনগুলোর তৎপরতার পরোক্ষ পরিণতিতে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে শুরু হয়েছে শিক্ষার জাগরণ। এ জাগরণ যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেছে সমান্তরালে পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদ ও প্রাচ্যবাদীদেরকে কাঠগড়ায়ও দাঁড় করিয়েছে। উপমহাদেশের স্কলাররা সিরাতে রাসুলের ওপর গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি প্রাচ্যবিদদের নানা অভিযোগের জবাবও দিয়েছেন। স্যার সাইয়েদ নিজের ঈমানী চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধের উপলব্ধির ফলে সমকালের প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম ম্যুর (William Muir : 1819-1905)-এর *The Life of Mohammad* প্রকাশিত হবার পর নীরব থাকা রীতিমতো নিজের জন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বহু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থটির নির্মোহ বিশ্লেষণ ও জ্ঞানভিত্তিক জবাবে *খুতবাতে আহমদিয়া* নামের গ্রন্থটি রচনা করেন (সাইয়েদ খ. ২, ১১৮)। অন্যদিকে ঊনিশ শতকের গোড়া থেকেই ভারতজুড়ে প্রাচ্যবিদদের তৎপরতার মোকাবেলায় জ্ঞানভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে। যা পরে আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং ক্রমশ জোরদার হয়।

অল্প সময়ের মধ্যে খ্রিষ্টবাদের জবাব ও প্রাচীন আর আধুনিক যুগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে (আলী নদভী ২৭)।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাইয়েদ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রাচ্যবাদীদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের নাম। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতা শুধু নন বরং একজন আইনবিদ হওয়ার পাশাপাশি বরেণ্য সমাজকর্মীও ছিলেন। তা সত্ত্বেও মৌলিকভাবে তাঁর লেখকসত্তাই ছিল মূখ্য। লন্ডনে অধ্যয়নরত অবস্থায় পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির জবাবে আল্লাহর রাসুলের সিরাত ও জীবনাদর্শ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেন যা ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর *The Spirit of Islam* গ্রন্থের সূচনা বস্তুত এর মধ্যদিয়েই হয় (কন্টভেল খ. ৩, ২৭২)।

ইসলাম বিষয়ে তাঁর নতুন ধারার রচনা পাঠকমহলে ব্যাপক সমাাদৃত হয়। বৃটিশ সমাজে তাঁর রচনাবলি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এটির ভাষাগত আঙ্গিক থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ইংরেজি ভাষায় লেখকের বলিষ্ঠ দক্ষতা রয়েছে। ভারতীয় ইংরেজি শিক্ষিতদের রচনায় সাধারণত যে ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাঁর এ গ্রন্থটি এ থেকে মুক্ত (আমীন ১৪০)।

শিবলী নোমানীর (১৮৫৭-১৯১৪) বিশ্ববিখ্যাত *সিরাতুন্নবী* গ্রন্থটি স্রেফ সিরাতগ্রন্থ নয় বরং এটি প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন অভিযোগের তাত্ত্বিক জবাব। গ্রন্থটির ভূমিকায়– যা সিরাত বিষয়ে লিখিত– ইউরোপিয়ান লেখকদের রচনাবলির ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে (নোমানী ৮৬-৯৯)।

ভারতীয় যে-সব বিজ্ঞ আলিম প্রাচ্যবিদদের প্রকাশ্য মোকাবেলা করেছেন, তাদের মধ্যে মানাযির আহসান গিলানি (১৮৯২-১৯৫৬), মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি (১৮৯২-১৯৭৭), মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদি (১৯০৩-১৯৭৯) ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভির (১৯১৩-১৯৯৯) নাম অগ্রগণ্য। পাক-ভারত উপমহাদেশের ধর্মতত্ত্ববিদগণ প্রাচ্যবাদী চিন্তার সঙ্গে কেবল পরিচিত ছিলেন না বরং এর চুলচেরা বিশ্লেষণও করেছেন তাঁরা। এর সূচনা করেন স্যার সাইয়েদ আহমদ খান। তিনি সাধারণত তাঁর রচনাবলিতে দুই শ্রেণির প্রাচ্যবিদের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করেন; যারা ইসলামের ওপর বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এবং যারা ইসলামের বিষয়ে খানিকটা নমনীয় ও সহানুভূতিশীল। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সেই গবেষক আলিমদের কাতারে রয়েছেন যাদের চিন্তাধারা হলো, প্রাচ্যবিদদের কতিপয় অনুসন্ধানী ও ইতিবাচক গবেষণাগুলো ইসলামের কল্যাণে কাজে লেগেছে। বিশেষত, আরবি ভাষায় কৃত গবেষণাকর্ম। কাজেই তাদের বক্তব্য হলো, এগুলো গ্রহণ করা, স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া দরকার। সাইয়েদ আমীর আলীর নামও সেই বিবেচনায় উল্লেখ করা হয় এবং তিনি প্রাচ্যবাদী চিন্তাকে বোঝার জন্য কোনো হঠকারিতা ছাড়া নির্মোহ চিন্তার আহ্বান জানান। এর ফলে সেসব গবেষণার ইতিবাচক অংশ থেকে উপকৃত হওয়া যাবে (নোমানী ৮৬-৯৯)।

প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ

"প্রাচ্য" শব্দটি "পাশ্চাত্য"-এর বিপরীতার্থক। এর অর্থ পূর্বাঞ্চল বা পৃথিবীর পূর্বের দেশসমূহ। বিশেষত এর দ্বারা এশিয়ার দেশগুলোকে বুঝানো হয়। প্রাচ্য শব্দের অর্থ- পূর্বদিকস্থ; এশীয়, পূর্বদেশীয় বা ইউরোপের পূর্বের দেশসমূহ। (এনামুল হক ৭৯৩) প্রাচ্যবিদ্যা মানে পূর্বাঞ্চলের জ্ঞানবিজ্ঞান বা সেখানে চর্চিত বিদ্যা। পরিভাষায় প্রাচ্যের বাইরের লোকদের কর্তৃক প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, মতবাদ ইত্যাদি নিয়ে লেখাপড়ার নাম প্রাচ্যবিদ্যা। এটাকে ইংরেজিতে Orientalism বলা হয়। "Oriental" শব্দ থেকে যার উৎপত্তি। আভিধানিক অর্থে Oriental এর অর্থ প্রাচ্যবিষয়ক, প্রাচ্য সম্বন্ধীয়, পূর্বাঞ্চলীয় ধারণা, দর্শন, মতবাদ ইত্যাদি। প্রাচ্যের মতবাদের পাশাপাশি প্রাচ্যের বাইরে লোকদের কর্তৃক তাদের ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদির চর্চাকেও Orientalism বলা হয়। যেমন আহমাদ আম্মার বলেন, "প্রাচ্যের বাইরে লোকদের কর্তৃক প্রাচ্যের ভাষা, সভ্যতা, দর্শন, সাহিত্য ও ধর্ম নিয়ে চর্চাকে প্রাচ্যবিদ্যা বলা হয়" (আম্মার ১৬)।

"প্রাচ্যবিদ্যা হলো প্রাচ্যের সাথে লেনদেন ও কাজ-কারবারের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। যেমন, প্রাচ্য বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিবৃতি, পঠন-পাঠন, সেখানে অবস্থান করা, শাসন করা। ড. এডওয়ার্ডের মতে : ''এককথায়, প্রাচ্যেকে জয় করা, পুনর্গঠন এবং নেতৃত্ব দানের নাম প্রাচ্যবিদ্যা" (সাঈদ ৩)।

মুসা আল হাফিজ বলেন, ''মুসলিমদের জ্ঞানবিজ্ঞানে অমুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হচ্ছে প্রাচ্যবাদ'' (আল হাফিজ ৫০)।

মালিক ইবন নবি (১৯০৫-১৯৭৩) বলেন,

الاستشراق هو مصطلح أو مفهوم عام يطلق على اتجاه فكري بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة ودراسة حضارة الإسلام والعرب خاصة.

''প্রাচ্যবিদ্যা হলো, এমন ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা, যা সাধারণত প্রাচ্যের জাতিসমূহের চিন্তাগত দিক তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির জীবনধারা চর্চাকে বোঝায়। বিশেষ করে ইসলাম ও আরব সভ্যতা সম্পর্কে অধ্যয়ন'' (ইবন নবি ৫০)।

"প্রাচ্যবিদ" এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Orientalist। শাব্দিক অর্থে One versed in the eastern languages "প্রাচ্যের ভাষাবিশেষজ্ঞকে Orientalist বলা হয়।" (অভিধান ৬২৪)

কলিং জেম ইংরেজি অভিধানে বলা হয়েছে, An expert in eastern language and history, "যিনি প্রাচ্যের ভাষা ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, তিনিই প্রাচ্যবিদ" (করম শাহ খ.৬, ১১৯)।

প্রাচ্যবিদ্যার সূচনাকাল

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা কখন এবং কোথা থেকে শুরু হয়েছে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক আছে। নিম্নে কয়েকটি মতামত পেশ করা হলো :

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা সূচনা হয়েছে ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে। এর জন্মস্থল হলো ভিয়েনার (https://bn.m.wikipedia.org) গির্জা। সে গির্জায় অনুষ্ঠিত পাদ্রিদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রমান্বয়ে আরবি বিভাগ খোলা হবে। (মাকজুক ২৫) কারো কারো মতে এর সূচনা হয়েছে ১২৬৯ সালে, যখন পর্তুগালের বাদশা দ্বিতীয় এলফনসু (১২১২-১২২৩ খ্রি.) মরিসালিয়ায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। সে প্রতিষ্ঠানে আবু বকর আর-রাকুতির নেতৃত্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁদেরকে গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও গ্রন্থ সার-সংক্ষেপকরণের কাজ দেয়া হয়। সে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেনিশ ভাষায় বাইবেল, তাওরাত ও আল-কুরআনের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (১১৯৪-১২৫০/ ফ্রেডারিক ১১৯৮ হতে সিসিলির রাজা, ১২১২ হতে জার্মানির এবং ১২২০ হতে ইটালির রাজা এবং ১২২৫ হতে জেরুসালের রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বড় ভূমিকা পালন করেন এবং জ্ঞানতাপস হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাইকেল স্কটের (১১৭৫-১২৩২/ মাইকেল স্কট একজন গণিতবিদ ও মধ্যযুগের বড় পণ্ডিত। তিনি ইবন রুশদের গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেন। তিনি সমকালে বুদ্ধিজীবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন এবং রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের উপদেষ্টা ছিলেন) তত্ত্বাবধানে একটি অনুবাদকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান তাঁর তত্ত্বাবধানে কিছু ইসলামি বিষয় ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে (দাইয়াব ১৪)।

কতিপয় গবেষকের মতে, আরো আগে থেকে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, ১১৪৩ সালে Peter the Venerable (১০৯২-১১৫৬)- এর নির্দেশে ল্যাটিন ভাষায় আল-কুরআন পরিপূর্ণ অনুবাদ করা হয়, যখন তিনি "ডিয়র" ('ডিয়র' আর্মেনীয় শব্দ। শাব্দিক অর্থে ক্ষেত ও কৃষকের ঘরকে বোঝায়। পরিভাষায়, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপাসনা ও ধ্যান করার ঘর। পাদ্রী বা ধর্মযাজকরা অবস্থান করেন। ডিয়র কলোনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৯১৩ সালে) কলোনি এর প্রধান ছিলেন। তার অন্তরে ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল।

প্রাচ্যবিদ্যার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি

পশ্চিমা পণ্ডিতরা ইসলামের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা-গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার বেশ কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে ব্যক্তি প্রাচ্যবিদদের ভিন্নতার ভিত্তিতে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ধরনের ভিন্নতা তৈরি হয়। তাছাড়া যুগের বিবর্তন ও সময়-পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনও এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈচিত্র আসার অন্যতম কারণ। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিশ্বাস ও জীবন সম্পর্কিত বিষয়াদির একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়

পরস্পর সম্পর্কিত। সে আলোকে প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞগণ প্রাচ্যবিদ্যার মৌলিক চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। একাধিক উদ্দেশ্যের অন্যতম কারণ হলো, এ বিদ্যাচর্চাকারীরা বিভিন্ন ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন শ্রেণির কারণেও তাঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং যেসব উদ্দেশ্যে এ বিদ্যার চর্চা হয়েছে তাতেও ভিন্নতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক (মুহাম্মদ নুর হোসাইন ২৯)।

প্রাচ্যবিদ্যার সংজ্ঞা থেকে এর উদ্দেশ্য কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। এ বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য ছিল একাধিক। আমাদের নিকট ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রধান বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও অন্যান্য উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন, জ্ঞানগত গবেষণার স্পৃহা, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, রাজনৈতিক অভিলাষ ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন (আল মাসউদ ৭২)।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও প্রাচ্যবাদী চিন্তাধারা

স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের প্রকৃত নাম সাইয়েদ আহমদ এই নামটি তৎকালীন দিল্লির বিখ্যাত দরবেশ তাঁর বাবার পীর হজরত শাহ গোলাম আলী রেখেছিলেন (ইকরাম ২৫৫; হোসাইন খ. ১,৪৫১)।

'স্যার' ইংরেজ কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর উপাধি (ফরিদাবাদী খ.১,৪৬০)। তিনি ৫ অক্টোবর, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে তার মাতামহ-এর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন (নাজির ২২৭; সওয়ারি তা.বি., ২১৫)। তাঁর পিতার নাম মীর মুত্তাকী (মতান্তরে মীর তকী আহমদ খান। তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু লোক ছিলেন) এবং মায়ের নাম আজীজুননেছা (Firoz 456) পিতৃ ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকে হোসাইনি এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর ৩৭ বংশধর ছিলেন (Gradham 287)। অতঃপর তিনি যুগের রীতি অনুযায়ী প্রথমে এক সম্ভ্রান্ত পর্দানশীন গৃহ শিক্ষিকার কাছ থেকে সমস্ত কুরআন দেখে পড়েন (Hosain N.D., 451-453)। কুরআন মাজীদের পাঠ শেষে তিনি স্থানীয় মকতবে ভর্তি হন (হালী ১০২-১০৩)। তিনি তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হাকীম গোলাম হায়দার খানের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। মোদ্দাকথা, স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের শিক্ষাজীবন নানার বাড়িতে সমাপ্ত হয়। তিনি তাঁর নানার কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান লাভ করা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তাঁর ওপর পরিবারের সমস্ত ভার ন্যস্ত হয়। তখন তিনি প্রবলভাবে একটি চাকুরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরি করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ বছর। যেহেতু সে সময় তিনি ইংরেজি ভাষা, বৃটিশ নিয়মকানুন ও আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন সেহেতু সর্বপ্রথম তিনি আদালতের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁর খালু খলীলুল্লাহ খানের কাছে শিক্ষাদীক্ষাও নিতে থাকেন। তিনি ১৮৯৮ খিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান সাচ্ছা ও স্বভাবসুলভ ইসলামপন্থী ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষের ইসলামি রক্তধারা বহন করছিলেন তিনি। সমাজের প্রভাব ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা তাঁর স্বভাবজাত ধর্মানুরাগ ও দ্বীনি চেতনার বন্ধনকে অধিকতর দৃঢ়তা দিয়েছে। তাঁর যোগ্যতাকে বিকশিত করেছে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা। নিজস্ব অনুভূতি, বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় চিন্তাধারাকে তিনি যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামি চিন্তাধারা ও বোধ স্যার সাইয়েদ আহমদকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলেছে। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তি ও আমলি সম্পর্কের সম্মিলিত রূপ হলো তাঁর লিখিত রচনাবলি ও গবেষণাকর্ম। তাঁর রচনাকর্মের শিরোনাম থেকে স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের গবেষণা, কুরআন, হাদিস, সিরাতে নববি, আসমানি গ্রন্থাবলি, কালামশাস্ত্র, তাসাওউফ ও ফিকহ বিষয়ে সীমাবদ্ধ মনে হলেও বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদিতে উসুলে হাদিস, ইতিহাস, নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর গবেষণার ছাপ লক্ষ করা যায় (হালী ১৫৯-১৮১)। শুরুর দিকের লেখালেখি ও রচনাবলিতে স্যার সাইয়েদ আহমদের মৌলিক উদ্দেশ্য তাসাওউফের শিক্ষাকে জাতির সামনে পেশ করা এবং উম্মতকে অনৈসলামি মতবাদ ও চিন্তাধারা থেকে বাঁচানোর প্রয়াস লক্ষণীয়। স্যার সাইয়েদ প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁদের হঠকারী কর্মপন্থা সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক, গ্রন্থকার, ইতিহাসলেখক কুরআন, হাদিস ও সিরাতে রাসুলের (সা.) ওপর যেসব অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন আপত্তি তুলেছেন স্যার সাইয়েদ আহমদ খান এসবের প্রত্যেকটি দালিলিকভাবে খণ্ডন ও নাকচ করেছেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন জ্ঞানসাধক।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অপরিমেয় দূরদর্শিতা ও জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি ঢালাওভাবে প্রাচ্যবিদদের কাজকর্মকে প্রত্যাখ্যান করেন নি; বরং ইতিবাচক ও গ্রহণযোগ্য কাজগুলোর স্বীকৃতিও দিয়েছেন উদারচিত্তে। স্যার সাইয়েদ আহমদের অনবদ্য রচনা *খুতবাতে আহমদিয়া* নবিজির প্রতি অসাধারণ ও অপরিসীম ভালোবাসার সাক্ষর বহন করে। তিনি বিশ্ববিখ্যাত এ গ্রন্থের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন: ইংরেজরা মুসলমান শাসক ও সরকারগুলোর ইতিহাস লিখতে গিয়ে অত্যন্ত অবিচার ও পক্ষপাতের আশ্রয় নিয়েছেন। এসব গ্রন্থ শিক্ষার্থীরা পড়ে; যার ফলে তাদের মন ও মগজে এর নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। বস্তুনিষ্ঠতা ও সততার সঙ্গে ঘটনাবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এমন গ্রন্থাবলির খুবই প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীর দুটি বড়ো ঘটনা একটি স্পেন (স্পেন উত্তর আফ্রিকার একেবারে সম্মুখভাগে ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এক অনিন্দ্যসুন্দর দ্বীপ নগরী। যা ওয়ালিদ ইবন্ আবদুল মালিকের যুগে তারেক ইবন্ জিয়াদ ও মুসা ইবন্ নুসাইর কর্তৃক বিজিত হয়) বিজয় আর দ্বিতীয়টি ক্রুসেড (ইংরেজদের দেওয়া নামে ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ বস্তুত ধারাবাহিক ধর্মযুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধগুলো মধ্যযুগে ল্যাটিন কেন্দ্রীয় গির্জা কর্তৃক অনুমোদিত ও অনুপ্রাণিত। যেখানে রোমশাসকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দস সন্নিহিত পবিত্র ভূমি মুসলমানদের কাছ থেকে মুক্ত করা) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে ঘিরে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত আটটি যুদ্ধের সঠিক চিত্র মানুষের সামনে প্রকাশিত হলে মুসলমানদের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর কাছে বাস্তব ধারণা উদ্ভাসিত হবে (স্যার সাইয়েদ ৩৮)।

খ্রিষ্টান লেখক মারাকেশি সম্বন্ধেও স্যার সাইয়েদ আহমদ লিখেছেন, তিনি ইসলামের অন্ধবিরোধিতায় সবসময়ে অবিচার করে গেছেন (স্যার সাইয়েদ ১৩)। স্যার সাইয়েদ আহমদ মিস্টার ডিন প্রেডিকেও ইসলামফোবিয়ায় আক্রান্ত গবেষকদের কাতারে গণ্য করেছেন। তাঁর বইপত্র পড়লে কোনো পাঠকের পক্ষে লেখকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য হাসি সংবরণ করা কঠিন হবে (স্যার সাইয়েদ: ১৩)। স্যার সাইয়েদ আহমদ লিখেছেন, জার্মানিতে ড. স্প্রিঙ্গারের (Aloys Sprenger : 1813-1893) একটি বই পাওয়া যায়; এটি ইবন্ ইসহাক (মৃ. ৭৬৭ খ্রি.) ও ওয়াকেদির (৭৪৭-৮২৩) ওপর ভিত্তি করে রচিত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চারখণ্ডের 'জীবনীগ্রন্থ' (স্যার সাইয়েদ ১৩)।

স্যার সাইয়েদ আহমদ কতিপয় এমন প্রাচ্যবিদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, যারা ইসলামের ব্যাপারে বাস্তব ও নির্মোহ অবস্থানে ছিলেন। তারা হঠকারিতা ও নীচতাকে খুব কমই প্রশ্রয় দিয়েছেন। সাধারণত সত্যাশ্রয়ী থাকার নীতি-আদর্শ ভুলুণ্ঠিত করেন নি মোটাদাগে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত একজন হলেন, জন ডিভানপোর্ট (John Davenport : 1597-1670)। সাইয়েদ আহমদ নিজের গ্রন্থাবলির বিভিন্ন জায়গায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বরাত দিয়েছেন। মুহসিন মালিকের নামে লিখিত একপত্রে স্যার সাইয়েদ আহমদ ডিভানপোর্ট সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে: ডিভানপোর্ট নামের একজন ইংরেজ ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যের সমর্থনে একটি চমৎকার ও অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেখানে তিনি ইসলামের নবী সম্পর্কে আলোচনা করেন। নবিজির জীবনচরিত, কুরআন মাজীদ ও ইসলামের ওপর কতিপয় ইংরেজের নানা অভিযোগ-আপত্তির জবাব দিয়েছেন যথাযথভাবে (স্যার সাইয়েদ ১৬০)। স্যার সাইয়েদ আহমদ *খুৎবাতে আহমদিয়ায়* ডিভানপোর্টের একটি অভিমত এভাবে উদ্ধৃত করেন:

> 'কারো এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, তাঁর জন্মভূমির (আরব উপদ্বীপ) লোকেরা নিকৃষ্ট প্রতিমা পূজায় দীর্ঘকাল যাবৎ ডুবেছিল; তাদেরকে এক ও সর্বভৌম আল্লাহর ইবাদতে ফিরিয়ে আনার গভীর প্রভাব বিস্তারে সংস্কার করেছেন। যেমন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করেছেন। সর্বব্যাপী মাদকের অভিশাপ ও জুয়া ইত্যাদির বিলুপ্তি। একইভাবে যথেচ্ছ বহুবিবাহ চালু ছিল ব্যাপকহারে। এসবের অনেককিছুই বন্ধ এবং সংস্কার করেছেন। এককথায় এমন বহুমুখী ও জীবনবাদী সংস্কারকে আমরা ধোকাবাজি কীভাবে বলতে পারি' (Davenport, 214)?

মারগোলিউথ (D.S. Margoliouth : 1858-1940) ও থিউডর নলডেকেও (Theodor Noldeke : 1836-1930) ইসলাম প্রসঙ্গে সত্যাশ্রয় ও ন্যায়নিষ্ঠতার পথে হেঁটেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি এনেছেন স্যার সাইয়েদ আহমদ: 'পৃথিবীর বহু মানুষকে তাঁরা এটা শিখিয়েছেন যে, ইসলাম একটি প্রাণময়, জীবন্ত ও মানবতার জন্য বিপুল

অবদান রাখা এক সুফলা জীবনবিধান। একইভাবে মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে নিজের নাম খোদাই করতে সক্ষম হয়েছেন' (স্যার সাইয়েদ ৫০)।

স্যার সাইয়েদ আহমদের মতে এডওয়ার্ড গিবনও (১৭৩৭-১৭৯৪) একজন ন্যায়নিষ্ঠ গবেষক। তিনি ইসলামের ব্যাপারে কোনো হিংসার পরিচয় দেন নি। স্যার সাইয়েদ আহমদ তাঁর লেখার বিভিন্ন জায়গায় গিবনকে উদ্ধৃত করেছেন : 'মুহাম্মদের ধর্ম যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত। আল্লাহর একত্ববাদের বড় সাক্ষী কুরআন। মক্কায় জন্মগ্রহণকারী এ পয়গাম্বর প্রতিমা, মানব, তারকা ও চন্দ্র-সূর্যের উপাসনাকে এই দলিল দিয়ে নাকচ করেছে যে, যা একবার উদিত হয়ে আবার অস্ত যায়; যা নশ্বর এবং একসময় নিঃশেষিত হয়ে যায়; অস্তিত্ব হারায় তা উপাস্য হতে পারে না। তিনি প্রতিপালক ও উপাস্যের এমন এক ধারণা উপস্থাপন করেছেন যে, সেই সত্তার আদি-অন্ত নেই, কোনো সীমিত ও নির্দিষ্ট স্থানের পরিসরে অবস্থান করেন না। যার শুরু বা শেষ বলতে কিছু নেই। যার দ্বিতীয়, সমকক্ষ কিংবা সমতুল্য কোনো সত্তা নেই (স্যার সাইয়েদ ২০)। স্যার সাইয়েদ আহমদ থমাস কার্লাইলের (১৭৯৫-১৮৮১) অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন নি; আশ্রয় নেন নি ভান-ভণিতার। *খুতবাতে আহমদিয়ায়* উদ্ধৃত তার একটি বক্তব্য পেশ করা হলো। যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার অন্তরে বিদ্বেষের হলাহল ছিল না। তিনি নিজের নির্মোহ বক্তব্য পেশ করেছেন এমন ভাষ্যে:

''আমাদের (খ্রিষ্টান) মধ্যে যে কথাটি প্রচারিত আছে যে, মুহাম্মদ একজন স্বভাবজাত উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন মিথ্যার অবতার! তার ধর্ম পাগলামী ও খামখেয়ালীর সম্ভারমাত্র। বর্তমানে এসব কথাবার্তা মানুষের কাছে ভুল ও বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়েছে। এসব লোকের (খ্রিষ্টান) যেসব মিথ্যাচার ও ধর্মীয় উগ্রতাপ্রসূত কথাবার্তা তাঁর (মুহাম্মদ) বিরুদ্ধে ছড়ানো হয়েছে আজকে তা সর্বোতভাবে আমাদেরকে লজ্জিত করছে'' (স্যার সাইয়েদ ২০)। তিনি আরও উল্লেখ করেন :

প্রাক-ইসলামি যুগে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আরবরা অনেক পিছিয়ে ছিল। পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলোর তালিকায় তাদের নাম ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে এই প্রত্যয়ী পয়গাম্বর এক বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন যাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে। ফলে তারা গোটা দুনিয়ায় মর্যাদার আসন অধিকার করে, ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল অংশজুড়ে তাদের প্রভাব ও দাপট ছিল (স্যার সাইয়েদ ৪৬০)। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ, জর্জ সেইল (1697–1736)) কুরআন মাজীদের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে লিখেন, আরবের সবচেয়ে অভিজাত গোত্র কুরাইশ যাদের ভাষাও অন্যান্য গোত্রের চেয়ে মার্জিত ও পরিশীলিত ছিল। কুরআন মাজীদ তাঁদের উচ্চাঙ্গ ভাষারীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে; যদিও অন্যান্য গোত্রের ভাষার কিছু মিশ্রণ রয়েছে–তবে তা নিতান্ত স্বল্প। এ ভাষারীতি আরবি সাহিত্যের জন্য আদর্শ। দৃঢ়বিশ্বাসী লোকদের অভিমত এবং এই মহাগ্রন্থের ঘোষণামতে, এরকম রচনা মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ কারণে এ গ্রন্থকে শাশ্বত মুজিযা বলা হয়েছে। খোদ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রিসালাতের সত্যতার ব্যাপারে এ মুজিযাকে উপস্থাপন করেছেন (স্যার সাইয়েদ ৪৬২)। (Humphrey, Dean of Norwich : 1648-1724) হাম্পরি ডিন অব নরভিচ পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে লিখেন: মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন, এই কুরআন মাজীদের মূল পাণ্ডুলিপি আসমানের লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। জিব্রাইল (আ.) যে পরিস্থিতিতে মানবজাতির জন্য যে সুরা প্রয়োজন তা আমার কাছে নিয়ে এসেছেন।

স্যার সাইয়েদ এ উক্তির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটা এমন অনর্থক বক্তব্য যার জবাব দেওয়াও বেহুদা। স্যার সাইয়েদ বলেন, মিস্টার গিবনও এরকম মূর্খতাপ্রসূত কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, রাসুলুল্লাহর হাদিস ও তাঁর সাহাবিদের বয়ান অনুসারে কুরআনের শাশ্বত ও চিরন্তন অস্তিত্ব মহান আল্লাহর অবিনশ্বর সত্তার মাঝে রয়েছে এবং লওহে মাহফুজে নূরের কলমে তাঁর লিখিত রূপ সংরক্ষিত আছে। কাগজে লিখিত মণিমুক্তা খচিত তার একটি কপি হজরত জিবরাইল শেষ আসমানে নিয়ে এসেছিলেন (স্যার সাইয়েদ ৪৬২)। হাদিসের গ্রন্থাবলি প্রসঙ্গে স্প্রিঙ্গারের ধারণা উদ্ধৃত করেছেন স্যার সাইয়েদ। স্প্রিঙ্গার বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে এখানে কতিপয় গ্রন্থ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারির কিতাবের নাম *আল জামিউস সহীহ*, আবুল হোসাইন মুসলিম ইবন্ হাজ্জাজ আল কুশাইরি নিশাপুরী কিতাবের নাম *সহীহ মুসলিম*, আবু দাউদ সুলাইমান ইবন্ আশআস আস সাজিস্তানির

গ্রন্থের নাম *সুনান আবু দাউদ*, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন্ ঈসা আত্ তিরমিযির গ্রন্থের নাম *সুনান তিরমিযি*, আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবন্ শুয়াইবের গ্রন্থের নাম *সুনান নাসায়ি*, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াজিদ ইবন মাজা আল কাযভিনির গ্রন্থ *সুনান ইবন্ মাজা*। এছাড়াও আরও কিছু গ্রন্থ আছে যা পূর্ববর্তী সময়ের গ্রন্থাবলির ওপর নির্ভরশীল, যা সুন্নিদের কাছে খুবই মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ। যেমন, *দারেমি*, *দারা কুতনি*, *ইবন্ ওয়াইনা*, *জুরকানি*, *আহমদ*, *বায়হাকি*, *হুমাইদি*, *বাগাভি*, *রাযি*, *ইবনুল জাওযি* ও *নববি*।' স্যার সাইয়েদ বলেন, আমরা যতদূর জানি, শেষের ১৪টি গ্রন্থ পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল নয়; কেবল বাগাভির মিশকাত ছাড়া। গ্রন্থটির অধিকাংশ বর্ণনা ইমাম বাগাভির সূত্রে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত নয় এবং উক্ত ছয়টি গ্রন্থে তা উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় কথা হলো, যে-সব হাদিসরূপে বর্ণনা যা পূর্ববর্তী সময়ের কোনো গ্রন্থে নেই অথবা কোনো মতাদর্শিক বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং বিশুদ্ধসূত্র পরম্পরায় প্রমাণিত নয় তা উপর্যুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সহীহ হাদিস হতে পারে না (স্যার সাইয়েদ ৪৬২)।

প্রাচ্যবিদ ও খ্রিষ্টবাদী লেখকেরা ইসলামকে যেভাবে একটি জবরদস্তিমূলক বর্বর ধর্মবিশ্বাস সাব্যস্ত করেছেন এবং প্রচারণা চালিয়েছেন যে, ইসলাম নৈরাজ্যবাদী মতবাদ আর শক্তির জোরে গোটা পৃথিবী শাসন করেছে– স্যার সাইয়েদ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এসব দাবি রদ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম মানবতার জন্য আশির্বাদ ও মুক্তির কাণ্ডারী এবং মুসার (আ.) ও ঈসার (আ.) ধর্মবিশ্বাস ইসলামের কাছে ঋণী।...''কিন্তু ইসলামের সবকিছুকেই খ্রিষ্টান লেখকেরা সবসময় মন্দ ও নেতিবাচক দৃষ্টিকোণে দেখে এসেছেন। ভালো দিক বাদ দিয়ে খারাপ বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা করে গেছেন। স্যার সাইয়েদ নিজের গবেষণাকেন্দ্রের গবেষকদের মাধ্যমে তাদের এসব বক্তব্যকে খণ্ডনের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন (স্যার সাইয়েদ ২৪৪-২৪৫)। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ গিবন লিখেছেন, মুহাম্মদের (সা.) জীবনাদর্শের একেবারে চূড়ান্ত যে দিকটি গভীর ভাবনার দাবি রাখে তা হলো, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা মানবতার সর্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত নাকি মানুষের জন্য ক্ষতিকর ছিল? রাসুলের ঘোরতর শত্রু কিংবা হঠকারী খ্রিষ্টানও স্বীকার করতে বাধ্য যে, নবিজির দাওয়াতি প্রক্রিয়া ও অনুসৃত নীতি মানবতার পক্ষে বিপুলভাবে কল্যাণকর ছিল (স্যার সাইয়েদ ২২৪)। অনুরূপভাবে *Apology* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষ্য করতে হবে যে, কতিপয় লোক একটা অসার দাবি করে থাকে, কুরআনের পয়গাম তরবারির জোরে ছড়িয়েছে। যাদের স্বভাবেই হঠকারিতা নেই তারা বিনাবাক্যে স্বীকার করবেন যে, প্রাচ্য-দুনিয়ার জন্য ইসলাম মহাকল্যাণের বার্তাবাহক (স্যার সাইয়েদ ২৪৯)।

স্যার সাইয়েদ *খুতবাতে আহমদিয়াসহ* তাঁর রচনাবলিতে (ইসলাম সম্বন্ধে) এরূপ ভ্রান্ত ধারণাকে এমনভাবে অপনোদন করেছেন যে, বিবেকবান, নির্মোহ ব্যক্তিমাত্রই– তিনি খ্রিষ্টান হোক বা অন্য ধর্মাবলম্বী– ইসলামের বিধান জিহাদ সম্পর্কে সমালোচনা বা আপত্তি তোলার কোনো সুযোগই থাকে নি। যারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখে এবং বোঝার সক্ষমতা আছে– কথিত সেই অভিযোগ–

لَآ إِكۡرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَىِّ

"ধর্মের (গ্রহণ করার) জন্য কোনো জবরদস্তি নেই। কারণ হেদায়েত ও গোমরাহীর পথ পরস্পর থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে গেছে" (কুরআন- ২, ২৫৬)। তাদের দাবি কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট এ আয়াতের সঙ্গে কত বৈপরিত্যপূর্ণ তা অনুধাবন করতে পারবে।

স্যার সাইয়েদ *Apology* গ্রন্থ থেকে নিম্নের কথাগুলো উদ্ধৃত করেন: 'সাম্প্রতিক দুইশ বছরে খ্রিষ্টানদের যুদ্ধবাজ অংশটি তুর্কিদের ওপর যে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চালিয়ে এসেছে, তাতে প্রাণহানি ঘটেছে লাখো মানুষের। এমন দীর্ঘ ও সর্বব্যাপী লড়াই খ্রিষ্টান সমাজ ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না, যা রোমান ক্যাথলিকদের রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে ওদের ধর্মীয় একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করতে অসম্মত হওয়ায় রাজা অষ্টম হেনরী ও তাঁর কন্যার নির্দেশে তাদের ওপর হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ফ্রান্সের সিনেট বারতুলো মেভ হত্যাকাণ্ডসহ চল্লিশ বছর যাবত সর্বব্যাপী রক্তপাত ও নিধন অভিযান অব্যাহত ছিল। ফ্রান্সে হেনরি প্রথম থেকে হেনরি চতুর্থের ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত সময় ধরে ধর্মীয় আদালতের নির্দেশে পরিচালিত

হত্যাকাণ্ডগুলো আজ পর্যন্ত ঘৃণ্য অপকর্ম হিসেবে এ কারণে স্মরণীয় যে, তা আদালতের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল। এর বাইরে এই বিশ বছরে ধর্মীয় বহু কুসংস্কারসহ অন্যান্য মন্দ কর্মকাণ্ডের বর্ণনাই তো উল্লেখ করা হয় নি। শেষকথা হলো, গত চৌদ্দশ' বছরে পৃথিবীর এক কোটি বিশ লাখ মানুষ ক্রুসেডারদের হাতে প্রাণ হারানোর মতো সন্দেহাতীত ঘৃণ্য কাজের এবং সম্ভবত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ঘটনা খ্রিষ্টানদের ছাড়া আর কারো ইতিহাসে নেই (স্যার সাইয়েদ ৩২৭)। স্যার সাইয়েদ আহমদ খান মানবেতিহাসের ক্ষণজন্মা মনীষীদের একজন। যারা প্রতিকূল অবস্থা ও বৈরী পরিবেশে নিজস্ব চিন্তাধারার শক্তিতে সময়ের স্রোতধারা পাল্টে দিতে পারে। স্যার সাইয়েদ কেবল সিরাতুন্নবী (সা.) বিষয়েই প্রাচ্যবিদদের চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করেন নি বরং ইসলামি চিন্তাধারা ও জীবনব্যবস্থার সামগ্রিক দিক নিয়ে প্রাচ্যবাদী চিন্তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাদের সামনে তুলে ধরেছেন ইসলামের স্বরূপ। এ কারণে স্যার সাইয়েদ তাঁর রচনাবলিতে হঠকারী অবস্থানের পরিবর্তে অনুসন্ধানী ও প্রামাণ্য বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এটা কেবল তার চিন্তার প্রতিবিম্বই নয়, ইসলামের বিশেষ খেদমত হিসেবেও পরিগণিত হয়েছে (স্যার সাইয়েদ ৩২৭)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও প্রাচ্যবাদী চিন্তাধারা

তিনি ১১ নভেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা খায়রুদ্দিন। পিতা ও পিতামহের সূত্রে মাওলানা আজাদের পরিবার আরবের হেজাজ এবং মক্কার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তাঁর পিতা একজন খ্যাতিমান পীর ছিলেন। আবুল কালাম আজাদের শিক্ষা প্রধানত পারিবারিক পরিসরে সম্পন্ন হয়। শিশু-কিশোরকালেই তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 'প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির পাঠ্যক্রমের সবগুলো বিষয় তিনি পিতার শিক্ষকতায় পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেন। এরপর আবুল কালাম আজাদ ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রথমে ফরাসি এবং পরে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। কিশোরকাল থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন এবং 'আজাদ' তাঁর কবিনাম (করিম ২০-২১)। উর্দু ভাষায় তিনি শক্তিমান বাগ্মী ছিলেন। কিশোর বয়সে মাসিক সাহিত্যপত্র '*লিসানে সিদক*' সম্পাদনা করেন। ১৯১২ সালে কোলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা '*আল হেলাল*' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে যুদ্ধ সম্পর্কে আল হেলালের ব্রিটিশ সরকারবিরোধী অবস্থানের কারণে সরকার পত্রিকাটির জামানত বাজেয়াপ্ত করে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতামত সর্বদাই ইংরেজ সরকারের বিরোধী এবং ভারত স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রামী চরিত্রের ছিল। তাঁর রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে ১৯১৬ সালে তাঁকে কোলকাতা থেকে বহিষ্কার এবং নজরবন্দি করে রাখা হয়। ১৯২০ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে মাওলানা আজাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্সের সভাপতি হন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। তিনি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা (করিম ২০-২১)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও ভারতের অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালে গান্ধীজিকে (১৮৬৯-১৯৪৮) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বৈদেশিক পণ্যবর্জন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব পেশ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত কার্যকর পন্থা প্রমাণিত হয়। ইংরেজ সরকার এর প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সর্বত্র গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। তখন ধীরেধীরে ইংরেজ শাসনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার আলামত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। (আলী নদভী ১২৬) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সমকালের একজন বড়মাপের ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে একাধারে বহুমাত্রিক প্রতিভার উপস্থিতি ছিল পূর্ণমাত্রায়। যদিও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রোজ্জ্বল কৃতিত্বের দীপ্তিতে অন্যান্য প্রতিভা ম্রীয়মান হয়ে গিয়েছিল। তিনি সমাজ, সাহিত্য, সাংবাদিকতা বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতার সাক্ষর রেখেছেন। আরবি, ফার্সি, উর্দু তিন ভাষাতেই তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। এসব ভাষায় দক্ষতার ফলে তিনি আরবিতে লিখিত প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাবলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং তাদের চিন্তাধারা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করতে পেরেছেন। তাঁর সম্পাদিত *আল হেলাল* ও *আল বালাগ* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মাওলানার লেখাগুলোর আঙ্গিকে আরবির প্রভাব সুস্পষ্ট।

সেইসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলো শাণিত, বলিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় গদ্যের নমুনা (আলী নদভী ১২৬)। সুরেশ কাশ্মিরী লিখেন, ''মাওলানা সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে ভালোমতো বুঝতে পারতেন। কুরআন মাজীদকে সর্বকালের সকল

সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজকে সেই ছাঁচে ঢেলে সাজাতে প্রয়াসী ছিলেন। কুরআনে কারীমের শ্বাশত পয়গামের আলোকে বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের চিন্তাধারা লালন করতেন তিনি' (সুরেশ ৪৮৩)।
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদের চিরস্মরণীয় কাজ হলো কালাম (ভাষার অলঙ্কার) শাস্ত্রের নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন। স্যার সাইয়েদের নতুন মু'তাজিলা আকিদায় মুসলমানরা কখনও সন্তুষ্ট ছিল না। তবে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এসবের জবাব দিয়েছেন। এটা সত্য যে, স্যার সাইয়েদের জীবৎকালেই ওলামায়ে কেরাম তার চিন্তাধারা রদ করেছেন। তাদের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নাম শীর্ষে। প্রবীণ আলেমদেরকে আল্লাহ কলমের শক্তি খুব বেশি দেন নি কিন্তু এ ক্ষেত্রে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ব্যতিক্রম। তিনি শক্তিমান লেখক ছিলেন (ইকরাম ২৬২)।

কাজেই মাওলানার মধ্যে জ্ঞান ও অনুসন্ধানের মৌল উপাদান ছিল পুরোমাত্রায়। ফলে অনেক বিষয়ের সমাধানে তাঁর সক্ষমতা ছিল সহজাত এবং অনন্য। এ কারণে তিনি স্বকালের আন্দোলনগুলোর চরিত্র বুঝতেন যথাযথভাবে এবং বিরাজিত প্রেক্ষাপটের আলোকে সমাজকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও প্রাচ্যবাদ

ইতিহাসে মুহাম্মদের (সা.) চেয়ে বাজেভাবে কাউকে বিচার করা হয় নি। অধিকাংশ পশ্চিমা ইতিহাসবিদ ভুলভাবে জেনেছেন এবং যেখানে সামান্যতম ত্রুটি উদ্ভাবনের সুযোগ পেয়েছেন সেখানে বানোয়াট বিষয়কে বাস্তবতার পোশাক পরাতে গলদঘর্ম চেষ্টা চালিয়েছেন। জে. জে. সান্ডার্স লিখেছেন, তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যাবে না; আরবের এ নবির প্রতি খ্রিষ্টানদের মনে সহানুভুতি ছিল। তাঁদের মতে হজরত ঈসার চরিত্র খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আর পবিত্র। খ্রিষ্টান বিশ্বকে ইসলামের কারণে কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

ক্রুসেড চলাকালীন পরিস্থিতিতে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না (Montgomery Watt, 148)। এরপর থেকে আজ অবধি দীর্ঘকাল যাবত সমালোচনা সাহিত্যের ঢঙে মুহাম্মদের (সা.) গালগল্প প্রচার হয়েছে (Saunders, 2003)।

অনুরূপভাবে ডব্লিউ সাউদার্ন লিখেছেন, '১১২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আরবদের মনে নবি আকরাম (সা.) সম্বন্ধে পরিষ্কার চিত্র হাজির ছিল কিন্তু এটা জ্ঞানলব্ধ চিত্র নয়। অন্যদিকে এর বিস্তারিত তথ্যের উৎসও ছিল বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনাপ্রসূত। সে সময়কার ইতিহাসবিদগণ নিজেদের স্বল্প জ্ঞানের ফলে নিজ নিজ ধারণার ওপর সন্তুষ্ট ছিল (Rechard 72)।
প্রাচ্যবিদরা বস্তুত, ইসলামের শিক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করার প্রয়াসেই লিপ্ত ছিল। চেষ্টা ছিল ইসলামের পরিবর্তে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও মৃত ভাষাসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার। ফিলিপ কে. হিট্টির (১৮৮৬-১৯৭৮) দৃষ্টিভঙ্গি মুতার যুদ্ধের মধ্যদিয়ে নবিজি (সা.) খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিলেন (Hitti 147)। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এই 'দ্বন্দ্ব তত্ত্বে'র জবাব দিয়েছেন এভাবে:

''ইসলাম যখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে সেই সময়টাতে আরব ও শাম অঞ্চলের সীমান্তবর্তী ভূখণ্ডে খ্রিষ্টানদের রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। যারা এ আন্দোলনের অগ্রযাত্রা সহ্য করতে পারছিল না। রোমক শক্তির প্রতাপে আক্রমণাত্মক আচরণ করতে থাকে বিভ্রান্ত এই শাসকচক্র। হজরত হারিস ইবন্ উমাইরের শাহাদতের মধ্যদিয়ে তাদের বাড়াবাড়ির প্রথম ঘটনাটি দৃশ্যপটে আসে। নবিজি ইসলামের দাওয়াতি পত্র দিয়ে তাকে মুতা প্রেরণ করেছিলেন। যেখানে ইবন শুরাহবিল গাসসানী অবস্থান করতো। তিনি হজরত হারিসকে বিনা উস্কানিতে হত্যা করে ফেলে। এ ধরনের আগ্রাসী আচরণ ও জুলুম

ইসলামের পয়গাম্বরকে পাল্টা জবাব হিসেবে যুদ্ধের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। কাজেই ৮ম হিজরিতে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ সময়ে কনস্টান্টিনোপলের শাসকও শামে ছিলেন। মুতার গভর্নর তার সহযোগিতা চাইলে তিনি তার পুরো বাহিনীকে রণাঙ্গণে পাঠিয়ে দেন; তারপরও বিজয় মুসলমানদেরই হয়েছিল'' (আজাদ ৪২২)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেন, ''এই ঘটনার পর সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলের আরব গোত্রগুলো মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয় এবং কনস্টান্টিনোপলের শাসকও তাদের সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। একবছর অতিক্রান্ত হবার আগেই সিরিয়া অঞ্চলে তারা সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। এর ফলে ইসলামের পয়গাম্বরকে তাদের প্রতিরোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। বস্তুত এই প্রতিরোধ অভিযানই ইতিহাসে তাবুক যুদ্ধ (৯ম হিজরি) নামে বিখ্যাত হয়েছে। নবিজি সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুসলমানরা বিপুল উদ্দীপনা আর বীরবিক্রমে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শত্রুদের পরিকল্পনা নস্যাত করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, একদিকে তাদের ওপর মুসলমানদের দিক থেকে যেহেতু তুমুল আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল, অন্যদিকে আরবের ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের চিরায়ত চক্রান্তে ছিল বরাবরই তৎপর। ফলে আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রের মতো মুসলমানদের পক্ষে ইহুদিদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া মুশকিল ছিল (আজাদ ৪২২)।

মাওলানা আবুল কালাম লিখেছেন, এর অর্থ এমন নয় যে, 'দুনিয়ার তাবৎ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওপর কেবল তারা ইহুদি বা খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য হামলা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়ে যায় অথবা কর না দেয়– যেমনটি ইসলামের সমালোচকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এমন দাবি কেবল তারাই করতে পারে যারা কুরআন মাজীদ, মহানবীর (সা.) জীবনচরিত, সাহাবাদের জীবনধারা ও ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারে অন্ধ। তিনি আরও লিখেছেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) কখনও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। বিশ্বজাহানের জন্য যে দ্বীন এনেছেন তা কল্যাণ, নিরাপত্তা, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সাফল্য ও সমৃদ্ধির বার্তাবাহী; তার মধ্যে নৃশংসতা ও ধ্বংসের অবকাশ নেই (আজাদ ৭৭৩)।

কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে জাতি ভূপৃষ্ঠে মানবতার বিচারে সর্বনিম্ন স্তরে ছিল তাদেরকে মানবিকতার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য হিসেবে তাদের গড়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا.

''স্মরণ করো, তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। তখন তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তাঁর দয়ায় তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলে; তখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন'' (আল কুরআন ৩, ১০৩)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রাচ্যবিদদের বিভ্রান্তি চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাদের ইতিবাচক গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিও দিয়েছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: 'মুসলমান তো সংখ্যায় অনেক কিন্তু তাদের জ্ঞানের পরিমাণ ও পরিধি কতটুক ? আজকে যদি আরবি ভাষায় ভালো ইতিহাস গ্রন্থ বা জ্ঞানকোষ প্রয়োজন পড়ে তখন ইউরোপের দিকে মুখাপেক্ষী হতে হয়। ইবন্ খালদুন, ইবন্ রুশদ, ইবন্ বতুতা, হাজী খলিফা, ইবন্ আসীর, মুকাইরিযি যারা ইসলামের আকাশে তারকাতুল্য ব্যক্তিত্ব অথচ তাদেরকে কেউ চিনে না। তাআব্বাত শাররা, ইমরাউল কায়েস, বুহতুরী ও আবু তাম্মামের দিওয়ান কত লোকে পড়েছে হয়তো। ইউরোপে বিপুলসংখ্যক পাঠক এগুলো পড়ে আর কুরআনের তরজমা পড়ে লাখো মানুষ (আজাদ ১৬০-১৬২)।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাবনা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রাচ্যবাদী আন্দোলনের বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, স্যার সাইয়েদ আহমদ খান মুসলিম স্কলারদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রাচ্যবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তাদের গবেষণাকর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। স্যার সাইয়েদ স্বদেশী ওলামাদের জ্ঞানগত দুর্বলতা বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। এ-কারণে তিনি নিজের লিখনী দ্বারা শুধু প্রাচ্যবিদদের মোকাবেলাই করেন নি বরং ইসলামের শিক্ষা ও সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়াসকে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। *খুতবাতে আহমদিয়ায়* তাঁর প্রাণঢালা ও হৃদয় উজাড় করা বিশ্লেষণ এর সাক্ষ্য বহন করে। তবে প্রাচ্যবাদী

চিন্তার খণ্ডনে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মধ্যে কর্মপদ্ধিতিগত ভিন্নতা রয়েছে। স্যার সাইয়েদ আহমদ খান প্রাচ্যবিদদের কাজের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, তাদের বেশিরভাগ কাজ হঠকারী ও বিদ্বেষপ্রসূত। প্রাচ্যবিদদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ইসলাম ও ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে সংশয় তৈরি করা। এ কারণে তাদের গবেষণায় সাধারণ মুলমানদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়। কাজেই স্যার সাইয়েদ আহমদ খান তাঁর লেখার ধাঁচে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। অবশ্য, এর পাশাপাশি তিনি ন্যায়নিষ্ঠ প্রাচ্যবিদদের কথাও উল্লেখ করেছেন– যাদের লেখায় হঠকারিতা ও বিদ্বেষ নেই এবং যারা মহানবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন (স্যার সাইয়েদ ১৫)।

অন্যদিকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রাচ্যবিদদের গবেষণা সম্বন্ধে সমালোচনা করার পাশাপাশি তাদের লেখা থেকে উপকৃতও হয়েছেন। আরবি-ফার্সি ভাষায় মাওলানার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সাংবাদিক হিসেবেও সমসাময়িককালে পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। এ কারণে তাঁকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের লেখালেখিতে দৃশ্যত প্রভাবিত মনে হয় এবং তিনি আরবি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের কথা বারবার বলতেন। তিনি সমৃদ্ধ আরবি ভাষায় প্রাচ্যবিদদের লেখা থেকে উপকৃত হবার তাগিদ দিতেন এবং এটাকে জ্ঞানের অন্যতম আধার মনে করতেন। তিনি চাইতেন, আরবি সাহিত্যে মুসলমানরা যেন গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং এ-বিষয়ক নীতিসূত্র ভালোভাবে আয়ত্ব করে। কাজেই যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে প্রাচ্যবাদের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। তাদের ভালো কাজের প্রশংসার পাশাপাশি ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের দালিলিক জবাব দিতে হবে। আবুল কালাম আজাদ স্যার সাইয়েদ আহমদের মতো তাকলীদ অস্বীকারকারী ছিলেন। যাবতীয় মৌলিক বিষয়ের সমাধান যেমন– সৃষ্টি সম্বন্ধীয় আইন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবনের মূলনীতি, নৈতিক মুল্যবোধ, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মানদণ্ড প্রভৃতি সবকিছুই তারা কুরআনে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন (আজিজ ২৫৫)।

অনেক জায়গায় কুরআন মাজীদ তাদাব্বুর, তাফাক্কুর, তাওয়াক্কুল অর্থাৎ গভীর চিন্তা, গবেষণা এবং আল্লাহর ওপর সোপর্দ করার তাগিদ দিয়েছেন। এগুলোর গুরুত্ব এত পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মনে হয়, চিন্তাশীলতা ও বোধশক্তির ব্যবহারই যেন ইসলামের সারবত্তা। মাওলানা এই বৈশিষ্ট্যের চমৎকার ব্যবহার করেছেন। নিজের রচিত তাফসীরগ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে পাঠকের ঈমান আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি আধুনিক দর্শনের পরিবর্তে কুরআন দিয়েই কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এরূপ তাফসীরেই কুরআন মাজীদের নিগূঢ় মর্ম সর্বোত্তমভাবে আয়ত্ব করা যায় (শাহজানপুরী ৩৭)।

উপসংহার

স্যার সাইয়েদ আহমদ উপমহাদেশের প্রাচ্যবিদদের রচনা, গবেষণা অধ্যয়নকারী প্রথম মুসলিম গবেষকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে বিশেষত, ইসলামবিষয়ক গবেষণার মতলবকে রীতিমতো ভয়ঙ্কর সাব্যস্ত করেন। কারণ এসব রচনাকর্ম ও গবেষণায় তারা ইসলামবিদ্বেষ উগড়ে দিয়েছেন। একই কারণে তিনি তাদের ভাষায় তাদেরকে জবাব দেওয়া এবং অসত্য বক্তব্য নাকচ করা জরুরি মনে করেছেন। তিনি নিজের রচনা *খুতবাতে আহমদিয়া* লিখে প্রামাণ্য জবাব ও বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলার সুচনা করেছেন। যেখানে প্রাচ্যবিদদের অভিযোগগুলোর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও দালিলিক জবাব দিয়েছেন

গবেষণাধর্মী ধাঁচে। জ্ঞানজগতে তিনি একক ও অনন্য অবস্থানের অধিকারী। আল্লাহ তাঁকে অসাধারণ দূরদর্শিতা ও হেকমত দান করেছিলেন। এ কারণে তিনি একদিকে প্রাচ্যবিদদের রচনাকর্ম অধ্যয়ন করেছেন এর ফলে তিনি ঢালাওভাবে সকল খ্রিষ্টান মিশনারী, ইতিহাসবিদ ও লেখকদের ইসলামের দুশমন সাব্যস্ত করেন নি। বরং ইসলামের প্রশ্নে কোনো প্রাচ্যবিদ সত্যাশ্রয়ী ও নির্মোহ গবেষণা করলে তার সত্যায়ন করেছেন: তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বহু দ্বন্দ্ব, বৈপরিত্যের পরও খ্রিষ্টানরাই অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমানদের নিকটবর্তী। তবে এরপরও স্যার সাইয়েদ খ্রিষ্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতাকে মুসলমানদের জন্য হুমকি হিসেবেই দেখেছেন। ভারতের ভেতরে-বাইরে প্রাচ্যবিদের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় স্যার সাইয়েদ আহমদের অবদান অনন্য কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ইহুদি ও খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের তাগিদে তিনি গ্রিক ভাষা অর্জন করেছেন এবং গ্রিক ভাষার পণ্ডিত মাওলানা এনায়েত রাসুল সিরিকোটির সহায়তা নিয়েছেন। যাতে তওরাত, যবুর প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সহজেই অধ্যয়ন এবং তাদের মৌলিক আপত্তিগুলোর জবাব দিতে পারেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মেধা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলেমসমাজ নিজ নিজ চিন্তাভাবনার সীমানা থেকেই দেখে থাকেন। তবে বাস্তবতা হলো, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ জ্ঞানের এক অতলান্ত সমুদ্রের নাম। তিনি ধর্মীয়, জাতীয় এবং শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানীদের রচনাবলির একজন বোদ্ধা সমঝদার এবং জ্ঞান তথ্যের জায়গায় উচ্চমার্গীয় ব্যক্তিত্ব ও পণ্ডিত। সাংবাদিক হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করলেও তিনি ইসলামি জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। প্রাচ্যবিদদের জ্ঞান-গবেষণার স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি; বিশেষত আরবি ব্যাকরণ, ফিকহাশাস্ত্রের মূলনীতি, আরবি সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা। তিনি তাকলিদ পছন্দ করতেন না এবং সরাসরি বিধানাবলির সূত্র-মূল্যনীতির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। এ কারণে তিনি একদিকে স্যার সাইয়েদ আহমদ খানকে নিজের পথনির্দেশক মানতেন অন্যদিকে ইসলামি বিধানসম্পর্কিত ইস্যুতে তাঁর সঙ্গে ভিন্নমতও পোষণ করতেন। যার মধ্যে জিহাদবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র

অক্সফোর্ড ইংলিশ অভিধান (ইংরেজি-বাংলা), ৩য় সংস্করণ, ২০১৩।

আল-কুরআন।

আবদুল্লাহ, সাইয়েদ, *আহমদ খান*, দায়েরায়ে মাআরিফ ইসলামিয়া, দানিশগাহ, পাঞ্জাব, ১৯৮০।

আমীন, আহমদ, *জুআমাউল ইসলাহ ফিল আসরিল হাদিস*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০৫।

আম্মার, আহমদ, *আল-ইসতিশরাক ও সনায়াহ আল-ফিকর আল-হাদ্দাম*, দার আমিনা, ২০১৬।

আল হাফিজ, মুসা, *প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ*, মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫।

আজহারি, করম শাহ মুহাম্মদ, জিয়াউন্নবি, ফারুকিয়া বুক ডিপু, তা. বি.।

আল মাসউদ, আবদুল্লাহ, *প্রাচ্যবাদের ইতিকথা*, সন্ধিপন প্রকাশন লি. ২০২৩।

আহমদ, আজিজ, *বররে সগির মে ইসলামী জদিদিয়ত*, ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৯৭।

ইবন নবি, মালিক, *ইন্তাজুল মুস্তাশরিকীন ওয়া আসরুহুম ফিল ফিকরিল ইসলামিল হাদিস*, দারুল ইরশাদাত, ১৯৬৯।

ইকরাম, শেখ মুহাম্মদ, *মাওয়ায়েজ-ই-এ কাউসার* আদবি দুনিয়া, ১৯৯১।

এডওর্য়াড, সাইদ, ড., *অরিয়েন্ট্যালিজম*, পেঙ্গুইন বুক, ২০০৩।

কাশ্মিরী, সুরেশ, *আবুল কালাম আজাদ*, চাটান, ২০০৯।

করিম, সরদার, ফজলুল, *দর্শনকোষ*, প্যাপিরাস, ২০০০।

খান, স্যার সাইয়েদ আহমদ, *খুতুতে স্যার সাইয়েদ আহমদ*, নিজামী প্রেস, ১৯৩১।

খান, স্যার সাইয়েদ আহমদ, *খুতবাতে আহমদিয়া*, দোস্ত এসোসিয়েটস উর্দু বাজার, তাবি.।

খান, স্যার সাইয়েদ আহমদ *খুতবাতে আহমদিয়া*, ১৮৭২।

দাইয়াব, মুহাম্মদ আহমদ, *আদওয়া আলাল ইস্তিশরাক*, *ওয়াল মুস্তাশরিকীন*, দারুল মানার, ১৯৮৯।

নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান*, (অনুবাদ, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন) সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৪।

নদভী, আবুল হাসান আলী, *ইসলামিয়াত আওর মাগরিবি মুসতাশরিকীন ও মুসলমান মুসানসিফীন*, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৮২।

নোমানী, শিবলী, *সিরাতুন্নবী (সা)*, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ২০১৫।

নুর হোসাইন, মুহাম্মদ, *প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ*, আল ইহসান প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ২০২০।

ফরিদাবাদী, সাইয়েদ হাশেমী, *তারিখ-এ মুসলমানানে পাকিস্তান ওয়া ভারত*, খ.১, আঞ্জুমানে তারাক্কি-এ উর্দু পাকিস্তান, ১৯৫২।

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, সম্পা: ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, ২০১০।

মাকজুক, মাহমুদ হামিদ, *আল-ইসতিশরাক ওয়াল খলফিয়্যাহ আল- ফিক্‌রিয়্যা লি আস-ছিরা* আল-হাদ্বারি, দার আল-মানার, ১৯৮৯।

শাহজানপুরী, আবু সালমান, *মাওলানা আবুল কালাম আজাদ : এক মুতালাআ*, মাকতাবায়ে উসলুব, ১৯৮৬।

সাঈদ, আহমদ, *হুসুলে পাকিস্তান*, এডুকেশনাল ইম-পারিয়াম, ১৯৮৫।

হোসেন, নাজির, *কিংবদন্তির ঢাকা*, প্যারাডাইস প্রিন্টার্স, ১৯৯৫।

হালী,আলতাফ হোসাইন, *হায়াতে জাবিদ*, আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে উর্দু, ১৯৪৯।

Davenport, John, *An Apology for Mohammed and the Koran* J. Davy and Sons, 1882.

Gradham, G.F.I, *The Life and Work of Syed Ahmaed Khan,* Idarah-I-Ababiayat-e- Qaasemi jan Street, 1974.

Hossain, Mahmud, *History of the Freedom Movment,* Vol. 1, Historical Society, N.D.

Hosain, Thuryya , *Sir Sayyid Ahmad Khan aur un ka ahad*, Vol. 11, Educational book house , 1993.

Hitti, Philip K., *Islam and the West,* Van Nostrand Reindhold, 1963.

Sherwari, Haroon Shah, *Studies in Muslim Politccal Thought and Administration* Ashraf Press, N.D.

Saunders, J.J. *A History of Medieval Islam*, Rourledge, 1978.

Southern, Rechard, William, *Western Views of Islam in the Middle Ages,* Harvard University Press 1962.

Watt, W. Montgomery *What is Islam,* London Stacey International, 2002.